১২.৩ সিয়াটো (SEATO)

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি চিনে ক্ষমতা দখল করেছিল। সেইসময় থেকে আঞ্চলিক স্তরে প্রতিরক্ষা নিয়ে অনেকে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে চিনের জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং কাইশেক ও ফিলিপিনসের প্রেসিডেন্ট কুইরিনো বাগুইওতে মিলিত হয়ে দূর প্রাচ্যের সব দেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়ার নেতা সিগম্যান রী ছাড়া আর কেউ সাড়া দেয়নি, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আগ্রহ দেখায়নি। কুইরিনো তার প্রস্তাব সংশোধন করে কমিউনিজম ও সামরিক ব্যবস্থাকে বাদ দেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বাগুইওতে যে সম্মেলন বসে তাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া এতে আগ্রহ দেখায়নি, তবে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিনস ও থাইল্যান্ড যোগ দিয়েছিল। এখানে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি, কোনো আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক কয়েকটি সামরিক চুক্তি করেছিল ফিলিপিনস ও জাপানের সঙ্গে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও আমেরিকার মধ্যে।[২] তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ এসব চুক্তিতে যোগ দেয়নি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব নিরাপত্তার কথা ভেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের কথা ভেবেছিল। এই পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হল এশিয়ার নেতৃত্ব এই সম্পর্কে উৎসাহ দেখায়নি। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে আমেরিকা পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি করেছিল (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। ভিয়েতনামে ফ্রান্সের অবস্থার অবনতি ঘটলে আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি সামরিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল।[৩] মায়ানমার, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া এই জোটে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেসের ব্রেনচাইল্ড হল সিয়াটো চুক্তি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জেনিভা চুক্তির পরেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপিনস ও থাইল্যান্ড ফিলিপিনসের রাজধানী ম্যানিলায় মিলিত হয়ে সাউথ ইস্ট এশিয়া কালেকটিভ ডিফেন্স ট্রিটি স্বাক্ষর করেছিল। প্রেসিডেন্ট ম্যাগসেসাই-এর উদ্যোগে এই সম্মেলন

---

২. এটি ANZUS নামে পরিচিত।

৩. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনামে ফ্রান্স কমিউনিস্টদের কাছে দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে পরাস্ত হয়।

প্যাসিফিক চার্টার ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণায় বলা হয় রাষ্ট্রসংঘের নীতি অনুযায়ী সব দেশ সমান অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে। শান্তিপূর্ণভাবে সব দেশ স্বশাসন ও স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার পাবে। এই অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে সব দেশ সহযোগিতা করবে। কোনো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণের চেষ্টা হলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি বাধা দেবে। সিয়াটো গঠনের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য দেখা দেয়। এই দুটি দেশ সিয়াটোর স্তম্ভ হলেও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেন মনে করেন জেনিভা সম্মেলন এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি আনবে। কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট দেশ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। ডালেস এই ক্ষেত্রে ইডেনের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। তিনি মনে করেন জেনিভা সম্মেলন শান্তি আনবে না। তিনি মনে করেন পশ্চিমি দেশ, ফিলিপিনস ও থাইল্যান্ড ইন্দো-চিনে কমিউনিস্ট জয়যাত্রায় বাধা দিতে পারে। তিনি মনে করেন সোভিয়েত রাশিয়া ও কমিউনিস্ট চিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য স্থাপন করবে, স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। সকলকে একজোট হয়ে বাধা দিতে হবে। ইডেন জেনিভা সম্মেলনে আস্থা রেখেছিলেন, তিন এই অঞ্চলের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব করেন যাতে শামিল হবে ভারতসহ ও অন্যান্য এশীয় দেশ। ইডেন অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব থেকে সরে আসেন, আমেরিকা যৌথ সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ায়।

প্যাসিফিক চার্টারে ছিল ন্যায় ও স্বাধীনতার কথা কিন্তু সিয়োটো গঠিত হলে কমিউনিস্ট দেশগুলি একে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী চিন ও ভিয়েতনাম একে জেনিভা চুক্তির পরিপূরক বলে গণ্য করেনি। আমেরিকা ও ব্রিটেন এরকম প্রচার করেছিল। চিনা প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন আমেরিকা জেনিভা চুক্তি ভাঙার জন্য বদ্ধপরিকর। অ-কমিউনিস্ট দেশগুলিও একে বিদেশি নিয়ন্ত্রিত সংগঠন বলে গণ্য করেছিল। একে অনেকে শত্রু বলেও গণ্য করেছিল। তবে ভিয়েতনামে কমিউনিস্টরা জয়ী হলে এবং কাম্বোডিয়া ও লাওসে তাদের জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে থাইল্যান্ড সিয়াটোকে স্বাগত জানিয়েছিল, ব্যাংকক হয় সিয়াটোর সদর কার্যালয়। আনজাসের মডেলে সিয়াটো চুক্তি হয়, এই চুক্তিতে ১১টি অনুচ্ছেদ ছিল। এতে বলা হয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা হবে, আত্মনির্ভরতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়া হবে। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পরকে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দেবে। কোনো দেশ আক্রান্ত হলে স্বাক্ষরকারী সব দেশ আক্রান্তকে সাহায্য দেবে। আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে সিয়োটোর সদস্যরা তা নিয়ে আলোচনা করবে। এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী সদস্যরা একটি কাউন্সিল গঠনের

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সিয়াটো রাষ্ট্রসংঘের বিধি মেনে চলবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি রক্ষা করবে। যদি কমিউনিস্ট আক্রমণের ঘটনা ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ব্যবস্থা নেবে।

যেসব দেশ সিয়াটো চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তারা আগে থেকে কোনো না কোনোভাবে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি ছিল। সিয়াটো কোনো পরিবর্তন আনেনি, ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। এর মূল নীতি ছিল সোভিয়েত রাশিয়া ও কমিউনিস্ট চিনের সম্প্রসারণে বাধা দেওয়া। মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট আগ্রাসনের সম্ভাবনা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিয়াটো দিয়ে কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। রাশিয়া ইউরোপে, আর চিন এশিয়ায় ছিল সম্প্রসারণবাদী শক্তি। আমেরিকা উভয়কে প্রতিহত করতে চেয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার পেয়েছিল। এই চুক্তি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নির্জোট দেশগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছিল শুধু কমিউনিস্ট আগ্রাসনের ক্ষেত্রে চুক্তি কার্যকর হবে। এই সিয়াটো চুক্তির সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হল স্বাক্ষরকারী দেশগুলি একই ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল না। এই চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা ছিল।

সিয়াটো চুক্তির ফলে, অনেকে মনে করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নব সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এশিয়ায় এটি হল আমেরিকার নতুন মনরো নীতি। এর অন্য তাৎপর্য হল যুদ্ধকে অনিবার্য বলে ধরা হয়, সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকাকে এশিয়ার শান্তি ও যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে হয়। ভারত এজন্য সিয়াটোর বিরোধিতা করেছিল। নেহরু মনে করেন সিয়াটো ঠান্ডা যুদ্ধকে ভারতের সীমান্তে নিয়ে এসেছে। নেহরু আরো মনে করেন কমিউনিস্ট অন্তর্ঘাত দমনের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে, কোনো সামরিক চুক্তি এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না।

সিয়াটো চুক্তির পঞ্চম অনুচ্ছেদে একটি কাউন্সিল স্থাপনের পরামর্শ ছিল। ব্যাংকক ও করাচিতে কাউন্সিলের সম্মেলন হয়। অনেকগুলি কমিটি গঠিত হয়, একটি সেক্রেটারিয়েট ও সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তথ্য সরবরাহ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শ্রমের অগ্রগতি ও অন্তর্ঘাতের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা এসব বিষয়ে কাউন্সিলকে পরামর্শ দেবে। ১৯৫৫-৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাউন্সিল তিনবার মিলিত হয়। সদস্য দেশগুলিকে সামরিক ও

অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়। এশিয়ার সদস্য রাষ্ট্রগুলি ৬২০ মিলিয়ন অর্থ সাহায্য পেয়েছিল। ব্যাংককে সিয়াটোর সামরিক ও বেসামরিক দপ্তর স্থাপিত হয়। যৌথ সামরিক মহড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সিয়াটোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এশীয় মানসিকতা সক্রিয় ছিল। তবে সর্ব এশীয় সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, অনেক বাধা ছিল। এশীয় দেশগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতায় রাজি ছিল কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পর্কে ছিল সন্দিহান। এই সংগঠন এশিয়ার বাইরের শক্তিগুলি পরিচালনা করত। এশীয় দেশগুলি উদ্যোগ নিতে পারত না। এশিয়ার দেশগুলিকে কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য এই চুক্তি করা হয়। তবে এশিয়ার দেশগুলি কমিউনিজম সম্পর্কে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল না। এজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ দেশগুলি এর সদস্য হয়নি। এশিয়া অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করতে হলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করা ছিল আবশ্যিক। প্রত্যেক দেশ প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে, বিরোধের নিষ্পত্তি করবে। প্রত্যেক দেশ বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। বৃহৎ শক্তি কোনো চাপ সৃষ্টি করবে না। সিয়াটো এইরকম অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি। এজন্য ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের পর সিয়াটো কার্যত পরিত্যক্ত হয়।